রাজশেখর বসু: পূর্ণাঙ্গ জীবনপঞ্জী

দীপেন সাহা

রাজশেখর বসু ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ (১২৮৬ বঙ্গাব্দের ৪ঠা চৈত্র) মঙ্গলবার বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ের কাছে বামুনপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বামুনপাড়ায় রাজশেখরের মাতুলালয়। পৈত্রিক বাড়ি নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের কাছে উলা বীরনগরে।

রাজশেখরের পিতা চন্দ্রশেখর বসু (১৮৩৩-১৯১৩)। ইঁহার পিতার নাম কালিদাস বসু। ইঁহারা মাইনগর সমাজভুক্ত বড়া নিবাসী কনিষ্ঠ ধবু বসুর সন্তান। চন্দ্রশেখরের বৃদ্ধপ্রপিতামহ রামসন্তোষ বসু পলাশী যুদ্ধের পঞ্চাশবর্ষ পূর্বে উলার মুস্তৌফী বাটীতে বিবাহ করেন। তৎকালে মুস্তৌফী বংশে মহা প্রতাপান্বিত ছিলেন। তাঁহারা সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে মুস্তৌফী খেতাব পাইয়াছিলেন। উক্ত বিবাহ উপলক্ষে মুস্তৌফীদিগের স্টেট হইতে ভূম্যাদি সম্পত্তি পাইয়া চন্দ্রশেখরের বৃদ্ধ প্রপিতামহাদি তাঁহাদের ভবনে বাস করেন এবং এ পর্যন্ত সেইখানেই চন্দ্রশেখর স্বীয় বংশের ভদ্রাসন প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন।" ('চন্দ্রশেখর বসু', "বঙ্গভাষার লেখক", হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩১১, পৃ.৬৫৯)।

চন্দ্রশেখর প্রথম জীবনে যশোহরের পোস্ট অফিসে কাজ করতেন। সেইসময় নীলকরদের অত্যাচারের বিবরণ লিখে তিনি রেভারেন্ড জেমস্ সেল-কে বিশেষ সাহায্য করেন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই সময়ে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। ইতিমধ্যে উলাগ্রামে মহামারীর প্রকোপে পিতা-মাতার মৃত্যু ঘটায় চন্দ্রশেখর গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর বর্ধমানে কালেক্টরীতে এবং মীরগঞ্জ নীলকুঠিতে তিনি কিছুদিন কাজ করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রশেখর দ্বারভাঙ্গা রাজস্টেটের তৎকালীন জেনারেল ম্যানেজারের সহকারী পদ গ্রহণ করেন। মধ্যে কয়েক বছর শারীরিক কারণে তিনি কলিকাতা ও বর্ধমানে নানা রকমের চাকরি করলেও ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবার দ্বারভাঙ্গা ফিরে যান এবং ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে পর্যন্ত সহকারী জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে সেখানে কাজ করেন।

চন্দ্রশেখর ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধর্ম ও সমাজ-বিষয়ে নিয়মিত প্রবন্ধাদি প্রকাশ করতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ,-অধিকারতত্ত্ব (১২৭৯)। বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি (১২৮২)। বেদান্ত প্রবেশ (১২৮২)। সৃষ্টি (১২৮২)। বেদান্ত দর্শন (১২৯২)। প্রলয়তত্ত্ব (১২৯২)। পরলোকতত্ত্ব

(১২৯২)। হিন্দুধর্মের উপদেশ (১২৯১)। এ ছাড়া তিনি 'ধবু বসুর বংশ পত্রিকা' নামে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেছিলেন।

চন্দ্রশেখর বসু তিনবার বিবাহ করেন! প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় অল্প বয়সে মারা যান। কয়েকবছর পরে হাওড়ার সুপুরিয়ার কাশীশ্বর মিত্রের কন্যাকে চন্দ্রশেখর বিবাহ করেন। তাঁর একটি কন্যা ছিল। দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর চন্দ্রশেখর তিরিশ বছর বয়সে বর্ধমানে বামুনপাড়ায় নৃত্যগোপাল দত্ত ও জগমোহিনী দত্তের কন্যা লক্ষ্মীমণি দেবীকে বিবাহ করেন। লক্ষ্মীমণি দেবীর গর্ভে চারপুত্র ও পাঁচ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন—ইন্দুমতী (পরে দত্ত), কুমুদবতী (পরে মুস্তৌফী), শশিশেখর (১৮৭৪-১৯৫৫), ঊষাবতী (পরে সোম), লীলাবতী (পরে ঘোষ), রাজশেখর (১৮৮০-১৯৬০), হিরণ্যবতী (পরে দত্ত), কৃষ্ণশেখর (১৮৮৪-১৯৭১), গিরীন্দ্রশেখর (১৮৮৭-১৯৫৩)।

রাজশেখরের ডাকনাম ছিল ফটিক। 'রাজশেখর' নামকরণের ইতিহাস প্রসঙ্গে শশিশেখর বসু লিখেছেন, 'দ্বারভাঙ্গা ঘুরে এসে একবার চন্দ্রশেখর বললেন, ফটিকের নাম ঠিক হয়ে গেছে। মহারাজ (লক্ষ্মীশ্বর সিং, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার দ্বিতীয় ছেলের নামও একটা শেখর হবে না কি? কি শেখর হবে? আমি বল্লাম, ইওর হাইনেস যখন তাকে আশীর্বাদ করছেন, তখন আপনি-ই তার শিরোমাল্য— আমি আপনার সামনে তার নামকরণ করলাম রাজশেখর। ('রাজশেখরের ছেলেবেলা', "যুগান্তর" শারদীয়া সংখ্যা ১৩৬০, পৃ.১৯)।

রাজশেখরের শৈশব ও বাল্যকাল কেটেছে দ্বারভাঙ্গায় পিতার কর্মস্থলে। পূর্বোক্ত প্রবন্ধটিতে বড়দাদা শশিখের 'রাজশেখরের ছেলেবেলা'র অনেক কৌতুককর ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। শৈশবে রাজশেখর ছিলেন অত্যন্ত কৌতূহলী ও জিজ্ঞাসু। খেলনা ভেঙে-ভেঙে তাঁর বিচিত্র 'এক্সপেরিমেন্ট' চলতো। শশিশেখর লিখেছেন, "সায়েন্স পাশ করবার আগেই ল্যাবরেটরী হল, দুই আলমারি অ্যাসিড, ক্লোরেট অব পটাস, কোব্যাল্ট, ক্লোরাইড ইত্যাদি। বোমা তৈরি করে ফাটাতো, কাগজের ব্যারোমিটার দেওয়ালে এঁটে বলতো বিষ্টি হবে কি না। আমাদের কাশি হলে কফ-মিকশ্চার প্রেসক্রিপসন লিখতো, কবিরাজি কেতাব আমি এনে দিতাম তাই পড়তো। টেম্পল মেডিক্যাল স্কুলে শখ করে মড়াও চিরতো। আমাকে গীতার বুকনি ইংরেজিতে ট্রানশ্লেট করে দিত, আমি সেগুলো টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, মাদ্রাজ মেল ও পাইওনীয়ারে নিজের বলে চালিয়ে দিতাম। তার অরিজিন্যাল কমপোজিশনে ঝোঁক হতে লাগল, কিন্তু সে কভারওয়ালা ম্যাগাজিন ভিন্ন লিখতো না; ডেলি পেপারকে গ্রাহ্য করতো না, এখনও নয়। যতদূর মনে পড়ে "ইন্ডিয়ান টিট্‌বিট্" ম্যাগাজিনে কি একটা লিখেছিল ছেলেবেলায় (তদেব, পৃ.২০)। "...ছেলেবেলা বা বুড়ো বয়েসের লেখা ছাপা না হলে কি সেটা সাহিত্য হয় না; 'পুরাণ' 'রামায়ণ' ইত্যাদি পাততাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেছিল; ডঃ সুনীতি চাটুজ্জে মহাশয় বোধহয় তাঁর অপিনিয়ন এবার বদলাতে পারেন,

'রাজশেখর পরিণত বয়সেই সাহিত্যরঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছেন' (কথাসাহিত্য, রাজশেখর সংখ্যা)। সাহিত্যরঙ্গ ১৮৯৩ সালেই শুরু হয়েছিল সুনীতিবাবুকে জানাই। বাংলা গল্প লেখার আগে রাজশেখর অন্যান্য ইংরেজী ম্যাগাজিনে লিখত। একটা মনে পড়ে 'দি টিউবওয়েল'। কলম একেবারে ঘুমিয়ে ছিল না। রাজশেখর সাহিত্য সম্রাট হয়েই জন্মেছিল। তা বন্ধ হবার জো নাই।" (তদেব, পৃ.২৫৫)।

১৮৮৮ থেকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজশেখর দ্বারভাঙ্গা রাজস্কুলে পড়াশোনা করেন এবং এই স্কুল থেকে চোদ্দ বছর নয় মাস বয়সে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সে বছর দ্বারভাঙ্গা রাজ স্কুলে রাজশেখর ছিলেন একমাত্র বাঙালী ছাত্র। হিন্দী ছিল তাঁর কাছে মাতৃভাষার মতো সহজ ও স্বচ্ছন্দ, একেবারে শৈশবে (১২ বছর পর্যন্ত) তিনি বাংলা বলতে পারতেন না।

এন্ট্রান্স পাশ করে পাটনা কলেজে এফ-এ পড়তে এলেন। কলেজে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। পাটনা কলেজে বাঙালী সহপাঠী ছিলেন জনা দশেক, তাঁদের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা চলতো। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহ এই সময়ে মনের মধ্যে জাগতে শুরু করে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজশেখর পাটনা কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বি-এ পড়ার জন্য কলিকাতা এলেন, ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। অনার্স ছিল ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রিতে। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অনার্স সহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। সেবছর অনার্স পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজেরই ছাত্র শরৎকুমার দত্ত, রাজশেখর দ্বিতীয় শ্রেণীতে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন।

একবছর পরে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজশেখর প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে রসায়ন শাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সে বছর প্রথম শ্রেণী কেউ না পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রে তিনিই প্রথম স্থানাধিকারী বলে পরিগণিত হন।

বিজ্ঞানের দিকে তাঁর আবাল্য ঝোঁক। তবু বৈষয়িক দিকের কথা ভেবেই সম্ভবত ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রিপন কলেজ থেকে বি-এল পরীক্ষা দেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অল্প কিছুদিন (মাত্র ৩ দিন) আইন ব্যবসায় নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করেন। কিন্তু আদালত-জীবন তাঁর পছন্দ হলো না। ফিরে এলেন বিজ্ঞান-চর্চার স্বক্ষেত্রে।

পরিচয় হলো আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে, তিনি তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যালে রাজশেখরকে ডেকে নিলেন। সজনীকান্ত দাস লিখেছেন, 'প্রসিদ্ধ চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী মহাশয় প্রেসিডেন্সী কলেজে কেমিস্ট্রি বিভাগে রাজশেখরের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তিনি তখন বেঙ্গল কেমিক্যালেরও অন্যতম কর্তা। কোনও নিরুদ্বিগ্ন শান্তিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হইবার জন্য রাজশেখর ভাদুড়ী মহাশয়ের শরণাপন্ন হইতেই তিনি তাঁহাকে বেঙ্গল কেমিক্যালের কেমিস্টের

পদে বহাল করিয়ে দেন।' ("শনিবারের চিঠি", পৌষ ১৩৪৬, পৃ.৪৬৩)। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রাজশেখর কেমিস্ট হিসাবে বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগ দিলেন। তারপর কেমিস্ট থেকে তিনি এক বছরের মধ্যেই হলেন প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার ও সেক্রেটারী। বেঙ্গল কেমিক্যাল ধরতে গেলে রাজশেখরেরই হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান। একদিকে গবেষণার কাজ অন্যদিকে ব্যবসায় পরিচালনা— উভয় ক্ষেত্রেই রাজশেখরের দক্ষতা ও সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর নিজের বাড়িতেও ছোটো একটি রসায়নাগার ছিল, সেখানে তিনি অবসর সময়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করতেন। সে পরীক্ষার ফলাফল বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হতো বেঙ্গল কেমিক্যালের রসায়নিক গন্ধদ্রব্য উৎপাদনে। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই রাজশেখর বাড়িতে সাবান, মাজন, কালি ইত্যাদি তৈরি করতেন। বেঙ্গল কেমিক্যালে কাজ করার সময়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় তিনি নতুন ধরনের কিছু রাসায়নিক পরীক্ষা শুরু করেন। বিদেশী সেন্টের চাহিদাই তখন বাজারে বেশি। ভালো দেশী সেন্ট সে সময়ে প্রায় ছিল না। রাজশেখর বিদেশী সেন্টের মতো উঁচুমানের সেন্ট বেঙ্গল কেমিক্যালে তৈরি করলেন। বিদেশী সেন্টে কি ধরণের রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হয় তা আবিষ্কার করার জন্য ফিজিওলজির সাহায্য গ্রহণ করেন। চিকিৎসাবিদ্যায় ঘ্রাণশক্তির ব্যবহার প্রচলিত থাকলেও রাসায়নিক বিশ্লেষণে তার প্রয়োগ আগে কেউ করেন নি। রাজশেখর কেমিস্ট্রি ও ফিজিওলজির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করলেন।

ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রেও রাজশেখরের বাস্তববুদ্ধি নিয়মনিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধ বেঙ্গল কেমিক্যালকে প্রতিষ্ঠাদানে সাহায্য করে। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, "বহুকাল আগে, কোনো কাজে বেঙ্গল কেমিক্যালের অ্যালবার্ট বিল্ডিং-এর দপ্তরে আমাকে একবার যেতে হয়েছিল। প্রয়োজন হলো কর্মসচিবের সঙ্গে দেখা করার। নাম পাঠিয়ে দেবার আধ মিনিটের মধ্যে তাঁর কামরায় ডাক পড়লো আমার, দেড় মিনিটের মধ্যে কাজটি সমাধা হয়ে গেল। কিন্তু এটুকু সময়ের মধ্যেই সেই সাহিত্যিক-কর্মসচিবের চরিত্র আমি অনুভব করেছিলুম; শাদা খদ্দরের গলাবন্ধ কোট পরা প্রৌঢ় মুখের ভাবটি প্রথমে একটু কঠোর মনে হয়, যাকে বলে 'কাজের লোক' সেই রকম তাঁর ধরণধারণ, কিন্তু ওরই মধ্যে প্রচ্ছন্ন অন্য কিছুর ঝিলিক দিচ্ছে— তাঁর স্বভাবের গভীরতর কোনো উদ্ভাস যেন। দেখে চমৎকৃত হলাম যে আপিশের খাতায় পরিষ্কার বাংলা হরফে তিনি স্বাক্ষর করলেন। ['রাজশেখর বসু', "সঙ্গ: নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ", ১৯৬৩, পৃ ৯২]। শুধু স্বাক্ষর নয়, বেঙ্গল কেমিক্যালের অনেক খাতাপত্র রাজশেখর বাংলায় লেখার ব্যবস্থা করেছিলেন। বিভিন্ন বিভাগের নামকরণে বাংলা পরিভাষার ব্যবহার তিনিই প্রথম শুরু করেন। সেই সঙ্গে বেঙ্গল কেমিক্যালের বিভিন্ন ওষুধপত্র সেন্ট সাবান ও প্রসাধন দ্রব্যের নামকরণে বাংলা ও সংস্কৃত শব্দের সুন্দর ব্যবহার তাঁর সৃষ্টি। 'তাছাড়া বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপনের লেখনী, ছবি ও বিভিন্ন জিনিষের সচিত্র লেবেল তাঁরই কল্পনাপ্রসূত ছিল।' [সুধীরচন্দ্র সরকার, 'রাজশেখর বসু',

"যষ্টিমধু", বৈশাখ ১৩৬৭, পৃ.১৫]। মানিকতলায় কারখানা, কাজের সুবিধার জন্য সেখানেই একটি বাড়িতে তিনি থাকতেন। কারখানা এবং অফিস— দু'দিকই তাঁকে দেখতে হতো।

দীর্ঘ তিরিশ বছর কাজ করে স্বাস্থ্যহানির জন্য ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তিনি প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার ও সেক্রেটারী পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। কিন্তু অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল কেমিক্যালের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলো না, তিনি টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসার ও একজন ডিরেক্টর হিসাবে মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যে-বছর রাজশেখর বি এ পাশ করলেন, সেই বছর তাঁর সঙ্গে মৃণালিনী দেবীর (১৮৮৬-১৯৪২) বিবাহ হয়। তাঁদের একমাত্র সন্তান প্রতিমা (১৯০১-১৯৩৪)।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় পত্র (১৩৩২) লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, 'অনেকে বলিয়া থাকেন যে চল্লিশ বৎসরের পর নূতন ধরনের কিছু কেহ রচনা করিতে পারেন না; কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখিয়াছি নিউটন ৪৩/৪৪ বৎসর বয়সের পূর্বেই আসাধরণ প্রতিভার পরিচয় দেন; কিন্তু গ্যালিলিও সেই বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর যুগান্তর সংঘটনকারী আবিষ্কার করেন; আবার (Schumann) শুমান পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পরে জড়-বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কারের দ্বারা জগৎকে চমৎকৃত করেন। রিচার্ডসন (Father of English novelists) পুস্তক-বিক্রেতা ছিলেন এবং আমার যেন স্মরণ হইতেছে, যখন পঞ্চাশ বৎসরের কাছাকাছি তখন তিনি নভেল লিখিতে হাত দেন। আমাদের পরশুরামও প্রায় ৪৩/৪৪ বৎসর বয়সে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্পটি রাজশেখর যখন লেখেন (১৯২২) তখন তাঁর বয়স বিয়াল্লিশ বছর। কিছুটা আকস্মিক মনে হতে পারে সন্দেহ নেই, কিন্তু রচনা প্রকাশ না করলেও লেখার অভ্যাস তাঁর ছিল অনেকদিন আগে থেকে, বিশেষ করে কবিতা রচনা। প্রথম গল্পটি যখন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় (মাঘ ১৩২১) প্রকাশিত হয়, তখন জনকতক ধুরন্ধর ব্যবসায়ীকে নিয়ে কৌতুক করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সাহিত্যসাধনায় পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করার কোনো বাসনা ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষ-এর সম্পাদক জলধর সেন মহাশয় তাঁকে আরও গল্প লিখতে অনুরোধ করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি লিখলেন 'চিকিৎসা-সঙ্কট', 'মহাবিদ্যা', 'লম্বকর্ণ', 'ভুশণ্ডীর মাঠে' ইত্যাদি। ['চিকিৎসা-সঙ্কট', 'গল্পটির পাদটীকায় লেখা ছিল, William Cane's Among the Doctors নামক গল্পের ছায়া অবলম্বন']। ১৩৩১ সালে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের উৎসাহে ও উদ্যোগে এই গল্পগুলি একত্র করে "গড্ডলিকা" গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। গড্ডলিকা রাজশেখরের প্রথম গ্রন্থ। এক বছরের মধ্যে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়।

'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পটি কিন্তু রাজশেখর বসুর নামে "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি— 'পরশুরাম' ছদ্মনামটি এই গল্পের প্রয়োজনেই প্রথম দেখা দিল!

কৌতুক-ব্যঙ্গপূর্ণ রচনার লেখক হিসাবে পরশুরাম নামটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'পিতৃদত্ত নামের ওপর তর্ক চলে না, কিন্তু স্বকৃত নামের যোগ্যতা বিচার করিবার অধিকার সমালোচকের আছে। পরশু অস্ত্রটা রূপধ্বংসকারীর,তাহা রূপসৃষ্টিকারীর নহে। পরশুরাম নামটা শুনিয়া পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে লেখক বুঝি জখম করিবার কাজেই প্রবৃত্ত। ("প্রবাসী", অগ্রহায়ণ ১৩৩২, পৃ.২১৫)। কিন্তু এই জাতীয় কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে রাজশেখর ছদ্মনামটি গ্রহণ করেননি, কিছুটা আকস্মিক ভাবেই পরশুরাম ছদ্মনামটি তাঁর প্রথম গল্পে ব্যবহার করেন— ছদ্মনাম তিনি একটা খুঁজছিলেন এমন সময়ে বাড়িতে এলেন স্বর্ণকার তারাচাঁদ পরশুরাম, এবং সেই পরশুরাম নামটি রাজশেখরের ভালো লেগে যায়। তিনি পরে নিজে বলতেন, এই নামের পিছনে অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নেই। পরে আরো গল্প লিখবো জানলে ও নাম হয়তো দিতাম না। (সুশীল রায়, মনীষী-জীবনকথা, ১৩৭৭, পৃ.১৬৫)। "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পটি প্রকাশকালে শিরোনামে 'শ্রীপরশুরাম বিরচিত' ও 'শ্রীনারদ চিত্রাঙ্কিত' কথাটি লেখা ছিল। 'শ্রীনারদ' হলেন যতীন্দ্রকুমার সেন। "কজ্জলী" গল্পগ্রন্থ প্রকাশকালে রাজশেখর 'উপরিচর বসু' ছদ্মনামটি ব্যবহার করার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু বন্ধুদের আপত্তির ফলে পরশুরাম নামটি বহাল থাকে।

"গড্ডলিকা"র গল্পগুলি যে আড্ডায় প্রথম পড়া হয়েছিল তার নাম ক্যালকাটা আরবিট্রারি ক্লাব,পরে তার নাম হয় উৎকেন্দ্র সমিতি। পার্শিবাগানে রাজশেখরের পৈত্রিক বাড়িতেই আড্ডা বসতো। এই আড্ডায় জলধর সেন, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সত্য রায়, অধ্যাপক মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক হরিপদ মাইতি, ডঃ দ্বিজেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অংশগ্রহণ করতেন। শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন ছিলেন এই সমিতির সভাপতি। রাজশেখরের দুই ভাই শশিশেখর ও গিরীন্দ্রশেখরও আড্ডায় অংশ নিতেন। কৃষ্ণশেখর কলিকাতায় এলে তিনিও উপস্থিত থাকতেন। মাঝে মাঝে উৎকেন্দ্র সমিতির অধিবেশনে এসেছেন যদুনাথ সরকার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ বিরজাশঙ্কর গুহ, শিল্পী পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, শিল্পী পুলিনচন্দ্র কুণ্ডু (দ্রঃ শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, 'উৎকেন্দ্র সমিতি', "কথা-সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩৬০, পৃ.৬১৮-৬২৪)।

উৎকেন্দ্র সমিতির এই অধিবেশনগুলিতে যতীন্দ্রকুমার সেন নিজে হাতে চা তৈরি করে সকলকে খাওয়াতেন। এখানে চা, দাবা ও তাসের সঙ্গে সাহিত্য, শিল্প, কাব্য, মনস্তত্ব, বিজ্ঞান পুরাণ ও ইতিহাস আলোচনা হতো। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে দু'দিন আলোচনা করেছিলেন। গিরীন্দ্রশেখরের "স্বপ্ন" (১৩৩৫) গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি এখানেই প্রথম পড়া হয়। রাজশেখর তখন মানিকতলায় বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানা সংলগ্ন বাড়িতে থাকতেন, কিন্তু প্রতি রবিবার তিনি পার্শিবাগান আসতেন এই আড্ডার

আকর্ষণে। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী পরবর্তীকালে লিখেছেন, 'একদিন সে (যতীন্দ্রকুমার সেন) তার কাজ করার ঘরের পাশেই ওখানকার বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে অনেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। এই আড্ডায় অনেক গুণী-পণ্ডিত বিদগ্ধ লোকের আসা যাওয়া চলতো। যজ্ঞেশ্বর (অর্থাৎ এই যজ্ঞের প্রধান) ছিলেন রাজশেখরবাবুর ভাই গিরীন্দ্রশেখর বসু। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুলেখক শশিশেখর বসু একজন নিয়মিত আড্ডাধারী ছিলেন। তাঁর গল্প টীকাটিপ্পনি এবং মন্তব্য ছিল অরুচি রূগীরও রুচিকর। আমি যেদিন প্রথম সে আড্ডায় প্রবেশ করলুম সেদিন রাজশেখরবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। ...দুই একদিন যেতে না যেতেই দেখা পেলুম। ...প্রথম দৃষ্টিতে রাজশেখরবাবুকে যত গম্ভীর লোক বলে মনে করেছিলুম দু একদিনের পরিচয়েই বুঝলুম তাঁর বাইরেটা যতই গাম্ভীর্যের বর্মে ঢাকা থাকুক না কেন, ভেতরে রসের ফোয়ারা ছুটতো। তার ওপর বড়দা অর্থাৎ শশিশেখরের টিপ্পনীর রসান চলতো। ...সবসময়ে শ্লীলতার গণ্ডী মেনে চলতো না। রাজশেখরবাবু খোলাখুলি ভাবে যোগ না দিলেও বেশ উপভোগ করতেন বলে মনে হতো।' ("যুগান্তর সাময়িকী", ৮ মে ১৯৬০)।

১৪ নম্বর পার্শিবাগানে উৎকেন্দ্র সমিতির এই আড্ডাই পরশুরামের গল্পে ১৪ নম্বর হাবসিবাগান রূপে আমাদের কাছে পরিচিত। উৎকেন্দ্র সমিতির সদস্যরা দু'বার পরশুরামের 'চিকিৎসা সঙ্কট' অভিনয় করেছিলেন; প্রথমবার রামমোহন লাইব্রেরি হল-এ, দ্বিতীয়বার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে। চিকিৎসা সঙ্কট গল্পটির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন যতীন্দ্রকুমার সেন।

"চলন্তিকা" রাজশেখরের এক অসামান্য কীর্তি। 'ভূমিকা'য় তিনি লিখেছেন, 'বাংলাভাষার একটি ছোট অভিধানের দরকার আছে— যাহা সহজে নাড়াচাড়া করিতে পারা যায় অথচ যাহাতে মোটামুটি কাজ চলে। যাঁহারা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের চর্চা করেন তাঁহারা প্রধানতঃ যে প্রয়োজনে অভিধানের সাহায্য লইয়া থাকেন, বিনা বাহুল্যে তাহা সাধিত করাই এই অভিধানের উদ্দেশ্য।' "চলন্তিকা" প্রকাশের আগে এবং পরে বাংলায় অনেক অভিধান সঙ্কলিত হয়েছে, কিন্তু আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান হিসাবে চলন্তিকা আজও আদর্শ বিবেচিত হয়। ছোট অভিধান বলেই চলন্তিকা-র শব্দসংখ্যা সীমাবদ্ধ, কিন্তু অভিধানটির প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হল, বাংলা শব্দের বানানের ক্ষেত্রে সমতা আনয়নের চেষ্টা এবং বাংলা পরিভাষিক শব্দের একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রণয়নের প্রয়াস। রাজশেখর বাংলা শব্দের বানান ও পারিভাষিক শব্দ নিয়ে সারাজীবন চিন্তা করেছেন। চলন্তিকা সঙ্কলনকালে বাংলা বানানের বৈচিত্র্য দূর করার জন্য রাজশেখর সাহিত্যিকদের মতামত গ্রহণ করেছিলেন; রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র রায় প্রমুখ লেখকদের কাছে তিনি বানানের তালিকা পাঠিয়েছিলেন।

"চলন্তিকা"-র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বছর পরে কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বাংলা বানানের নিয়ম স্থির করার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয় (নভেম্বর ১৯৩৫)। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন রাজশেখর বসু এবং সম্পাদক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকাটি যখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হলো রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকের 'বাংলা বানান সম্বন্ধে যে নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন আমি তাহা পালন করিতে সম্মত আছি',— এই মর্মে তাঁদের সমর্থন জানান। প্রকৃতপক্ষে "চলন্তিকা" সঙ্কলয়িতা রাজশেখরের প্রয়াস-প্রযত্নের ফলেই বাংলা বানানের ক্ষেত্রে আজ অনেকটা সমতা এসেছে। সজনীকান্ত দাসের ভাষায়, "ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তিনি বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক গোড়াপত্তন করিয়াছেন এবং বাঙালীর ঢিলাঢালা এলোমেলো প্রকৃতিতে একটা বাঁধন আনিয়া দিয়াছেন। অথচ এই বাঁধনে কষ্ট নাই, অপমান নাই। 'চলন্তিকা' মারফৎ আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারেই ভাষার শৃঙ্খলা শিখিতেছি। সাহিত্যকর্মী রাজশেখরের ইহা একটি বিপুল কীর্তি।" ('সাহিত্যকর্মী শ্রীরাজশেখর বসু', "কথাসাহিত্য", শ্রাবণ ১৩৬০, পৃ, ৬৩৬-৬৩৭)।

পারিভাষিক শব্দের জন্যও "চলন্তিকা"র আশ্রয় আমাদের নিতে হয়। যদিও "চলন্তিকা"র ভূমিকায় রাজশেখর বসু জানিয়েছেন, "পরিশিষ্টে যে পারিভাষিক শব্দাবলী দেওয়া হইয়াছে তাহার 'পাটীগণিত' হইতে 'মনোবিদ্যা' প্রভৃতি বিষয়ক অংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকলন হইতে উদ্ধৃত। 'সরকারী কার্য' বিষয়ক অংশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংকলন হইতে উদ্ধৃত।" কিন্তু আসলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকলন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্কলন দুটিও প্রধানত রাজশেখরের উদ্যোগের ও অনেক পরিমাণে তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়াসের ফল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে পরিভাষা সমিতি গঠন করে, তার সভাপতি ছিলেন রাজশেখর বসু। পরিভাষা সমিতির সহকারী সম্পাদক প্রমথনাথ বিশি পরবর্তীকালে সমিতির অধিবেশনের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, "বিজ্ঞানের নানা শাখার পরিভাষা সঙ্কলিত হচ্ছে, নানা শাখায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আছেন, সভাপতির সব শাখাতেই সমান অধিকার। বাঙালীর সভার কাজ চালানো সহজ নহে, কাজের কথাকে ছাপিয়ে ওঠে অকাজের কথা। অকাজের কথায় সভাপতি যোগ দেন না, চুপ করে শোনেন, কিছুক্ষণ পরে কথার মোড় ঘুরিয়ে কাজের কথার নিয়ে এসে ফেলেন। কোন একটা বিষয়ে কতজন কতরকম মন্তব্য করছেন সভাপতি নীরব শ্রোতা, সকলের সব মন্তব্য শেষ হলে দুটি একটি ক্ষুদ্র কথায়— শিখা জ্বেলে দিলেন তিনি। সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল। এই সভা দীর্ঘকাল চলেছিল। দীর্ঘকাল তাঁকে টেবিলের অন্য প্রান্ত থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। কখনও কখনও সভার অধিবেশন বসেছে তাঁর সুকিয়া স্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে। বস্তুতঃ সভা চালাতে এমন যোগ্য সভাপতি আমার চোখে পড়েনি। সভাপতির মধ্যে কোনদিন গড্ডলিকার লেখককে দেখতে পাইনি, বড়ো জোর দেখতে পেয়েছি বেঙ্গল কেমিক্যালের অভিজ্ঞ ম্যানেজারকে। ব্যক্তিত্বের শক্তিতে তিনি রাজশেখর বসু। পরশুরামকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোঠায়

রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। কয়েক বৎসর পরে কাজ শেষ হয়ে গেলে পরিভাষা কমিটি উঠে গেল, পরিভাষা কমিটির সিদ্ধান্তগুলি এখন 'চলন্তিকা' অভিধানের পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে।" (ভূমিকা, "পরশুরাম গ্রন্থাবলী", প্রথমখণ্ড ১৩৭৬, পৃ,৩-৪)।

পরবর্তীকালে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষভাবে সরকারী কাজে ব্যবহারের জন্য যে পরিভাষা সংসদ গঠন করেন, তাতে রাজশেখর বসু সভাপতি নিযুক্ত হন। রাজ্যসরকারের দফতর থেকে জানা যায় ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর রাজশেখর স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রধান কর্মসচিবকে চিঠিতে লিখেছেন যে, ১৭ই অক্টোবরের চিঠি অনুযায়ী পরিভাষা সংসদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি যথাশক্তি চেষ্টা করবেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর রাজশেখর বসুর বাড়িতে পরিভাষা সংসদের প্রথম অধিবেশন হয়। সংসদের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, দুর্গামোহন ভট্টাচার্য এবং যুগ্ম-সম্পাদক মন্মথ রায় ও পতঞ্জলি ভট্টাচার্য।

বাংলা ছাপাখানার ইতিহাসেও রাজশেখরের বিশিষ্ট দান স্মরণীয়। বাংলা লাইনো টাইপের উদ্ভাবক সুরেশচন্দ্র মজুমদার, কিন্তু এই কাজে তাঁর অন্যতম সহায় ছিলেন রাজশেখর। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর লাইনো টাইপ কোম্পানীর শো-রুমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলা লাইনো টাইপ যন্ত্রের কর্মারম্ভের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে রাজশেখর বসুও উপস্থিত ছিলেন। লাইনো টাইপ কোম্পানীর পক্ষ থেকে মিঃ গেভিল বলেন, 'শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদারের অক্লান্ত চেষ্টায় ইহা সম্ভব হইয়াছে; শ্রীরাজশেখর বসু তাঁহাকে এ কার্যে সহায়তা করিয়াছেন। মূল অক্ষরগুলির আকৃতি অঙ্কন করিয়াছেন যতীন্দ্রকুমার সেনের সহায়তায় এস.কে.ভট্টাচার্য।' সুরেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, 'আমার চেষ্টার ফলে লাইনো যন্ত্রে বাংলা অক্ষর মুদ্রণের একটা উপর উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পারিভাষিক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র সেন প্রভৃতি আমাকে এ বিষয়ে প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন। সে সাহায্য না পাইলে আমার পক্ষে এ কার্য করা সম্ভব হইত না।' ("আনন্দবাজার পত্রিকা", ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৫)।

সুরেশচন্দ্র মজুমদার লাইনো টাইপকে বাজারে চালু করেছিলেন, কিন্তু যুক্তাক্ষরের জট ছাড়িয়ে সহজ হরফ তৈরি করেছিলেন রাজশেখর বসু। বাংলা লাইনো টাইপে প্রথম সম্পূর্ণ মুদ্রিত বই পরশুরামের "হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প", দ্বিতীয় সংস্করণ।

সভা-সমিতি উৎসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে রাজশেখরের খুব একটা যোগাযোগ ছিল না। বক্তৃতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না, কর্মে ছিল তাঁর একান্ত নিষ্ঠা। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেননি, কিন্তু ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (The National Council of Education) প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন তিনি সক্রিয়ভাবে পরিষদের বিভিন্ন কর্মানুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। রাজশেখর শুধু 'কাউন্সিল'-এর

সভ্য ছিলেন না, তিনি ফ্যাকালটি অফ সায়েন্স' এবং ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যানুফ্যাকচার ও কমার্সের বোর্ড অফ স্টাডিস'-এরও সদস্য ছিলেন। (The National Council of Education, Bengal, Calender, 1906-1908, Calcutta,1908, pp27, 30, 34, 36 etc.)

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে যে, মানিকতলার বাগানে বিপ্লবীদের বোমা তৈরীর ব্যাপারে রাজশেখর মালমশলা দিয়ে সাহায্য করতেন। বোমা তৈরির ফর্মূলাও রাজশেখরের। বিপ্লবীদের পরিবারকে তিনি গোপনে অর্থ সাহায্যও করতেন।

সাহিত্য-সংগঠন যেগুলির সঙ্গে রাজশেখর কোনো সময় যুক্ত ছিলেন, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'রবিবাসর' ও 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'। ১৩৩৬ সালে 'রবিবাসর' প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম যুগে কিছুদিন 'রবিবাসর'-এর সম্পাদক ছিলেন সেই সময়ে রাজশেখর 'রবিবাসর'-এর সদস্য হয়েছিলেন। যোগেশচন্দ্র বাগল রবিবাসর-এর একটি অধিবেশনের কথা লিখেছেন, "কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা" সাহিত্য ও আর্ট শিরোনামার একটি সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ইহার পর যে আলোচনা চলে তাহাতেও যতদূর স্মরণ হয় অল্পভাষী রাজশেখর যোগদান করিয়াছিলেন। রাজশেখরবাবু রবিবাসরের আরও কোন কোন অধিবেশনে যোগদান করিয়া থাকিবেন। তবে এইবারে অধিবেশনে তাঁহার যোগদানের কথা আমার স্মৃতিপটে জ্বল জ্বল করিতেছে।"('রাজশেখর বসু', "বসুধারা", জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯, পৃ.৩২০)।

এর কিছুকাল পরে (১৩৪০) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহেই রাজশেখর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সদস্য হন। যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন, 'রাজশেখরবাবু পরিষদের সভ্য হইয়াছেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের মতো এতবড় প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার তিনি। তাঁহাকে যদি সাহিত্যপরিষদের সম্পাদকরূপে পাওয়া যায় তাহা হইলে ইহার কার্য কিরূপ সুপরিচালিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁহার (ব্রজেন্দ্রনাথের) বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। রাজশেখরবাবু খ্যাতনামা সাহিত্যিকও বটেন। তিনি প্রথমে রাজী না হইলেও ব্রজেন্দ্রনাথের নির্বন্ধাতিশয্যে পরিষদের সম্পাদকের পদ গ্রহণে সম্মত হন। কিন্তু পরিষদের নিয়মতন্ত্র অনুসারে তো ইহা করিতে হইবে। পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন-সভায় রাজশেখরবাবুর নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইল এবং তিনি অধিক সংখ্যক ভোটে সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন। রাজশেখরবাবু সম্ভবতঃ দুই বৎসর সম্পাদকের কার্য করেন। এই সময়ে তিনি দৈনন্দিন কার্যপরিচালনায় যে সব নিয়মকানুন চালু করিয়া যান তাহাতে পরিষদের ক্রমোন্নতি শুধু অব্যাহত নয়, ত্বরান্বিত হইতে থাকে।' (তদেব, পৃ ৩২০-২১)। রাজশেখর ১৩৪০ এবং ১৩৪১ সালে সাহিত্য পরিষৎ "ভারতকোষ" প্রকাশের পরিকল্পনা করলে রাজশেখর বসুর সাহায্য গ্রহণ করা হয়। "ভারতকোষ"-এর সম্পাদক ছিলেন। ১৩৪১ থেকে ১৩৪৪ সাল পর্যন্ত এবং ১৩৫২ ও ১৩৫৩ সালে তিনি পরিষদ এর সহকারী-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ "ভারতকোষ"-এর প্রথমখণ্ডের

'মুখবন্ধে' বলা হয়েছে 'রাজশেখর বসু মহাশয় গ্রন্থের পরিকল্পনা প্রণয়নে অগ্রণী ছিলেন।' ("ভারতকোষ", প্রথমখণ্ড, ১৩৭১, পৃ.১৩)।

ইন্ডিয়ান সাইকো-অন্যালিটিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে প্রতিষ্ঠা (১৯২২ খ্রীঃ) থেকেই রাজশেখরের যোগাযোগ ছিল। ভ্রাতা গিরীন্দ্রশেখর ছিলেন এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। সমিতিতে মনঃসমীক্ষণ ও মনোবিদ্যার চর্চা হতো এবং সেজন্য একটি মানসিক ব্যাধির হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজশেখর বসু কলিকাতার তিলজলা এলাকায় বেদিয়াডাঙ্গা রোড-এ কুড়ি হাজার টাকা মূল্যের একখণ্ড জমি ও বাড়ি সমিতিকে হাসপাতালের জন্য দান করেন। এই হাসপাতাল পরবর্তীকালে লুম্বিনী পার্ক নামে পরিচিত। লুম্বিনী পার্কের হীরকজয়ন্তী উপলক্ষে রচিত ইতিহাসে লেখা হয়েছে, "The execution of the plan had however to be delayed by another two years until Dr. Bose's (Girindrasekhar) Mejda, late Shri Rajsekhar Bose (a master of Bengali humorours prose, famous as Parashuram) made a gift of a house at Tiljala to the Society for the purpose of starting a mental hospital. Further, the Society received as gift all the necessary furniture and medicines from the Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd, through Shri Rajsekhar Bose's influence. A few other well-wishers too contributed their mite. All these finally enable the Indian Psychoanalytical Society to start its mental hospital on 5th of February 1940, 'Lumbini Park' (the name of the birth place of Lord Buddha) happened to be the name of Shri Rajsekhar Bose's house and the Society decided to name the mental hospital after it." (Lumbini Park-A brief outline,' *Lumbini Park Silver Jubilee Souvenir* 1966, pp26)। শুধু জমি-বাড়ি দেওয়া নয়, রাজশেখরের আগ্রহে ও আনুকূল্যে লুম্বিনী পার্ক বেঙ্গল কেমিক্যালের কাছ থেকে ঔষধপত্র ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র পায়। ওই অঞ্চলে কোনো সাধারণ হাসপাতাল না থাকায় স্থানীয় দরিদ্র রোগীদের জন্য লুম্বিনী পার্ক হাসপাতাল একটি আউটডোর চিকিৎসালয় স্থাপন করলে তার জন্যও প্রতি মাসে বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে বিনামূল্যে ঔষধাদি দেওয়ার ব্যবস্থা রাজশেখর করেন। পানীয় জলের জন্য একটি টিউবওয়েল স্থাপনেও রাজশেখর উদ্যোগী হন। তিলজলা অঞ্চলে তখন গ্যাস-লাইন ছিল না। রাজশেখর বেঙ্গল কেমিক্যালের ইঞ্জিনিয়ারের সহায়তায় একটি গ্যাস-বার্নার বসিয়ে কেরোসিন থেকে গ্যাস তৈরির ব্যবস্থা করেন।

রাজশেখর সারাজীবন কলিকাতায় বাস করলেও পৈত্রিক বাসস্থান উলা-বীরনগরের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করতেন। পল্লী উন্নয়নমূলক কাজে তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। আর পাঁচটি পরিত্যক্ত অনুন্নত গ্রামের মতোই ছিল উলা-বীরনগর। পাকা রাস্তা ছিল না, হাসপাতাল ও স্কুল ছিল না; ম্যালেরিয়া আক্রান্ত গ্রামবাসী প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছিল। ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বীরনগর স্টেশনসংলগ্ন এলাকার অনেক জমি সংগ্রহ করে বীরনগর উন্নয়ন সমিতি

গঠিত হয়। রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, গিরীন্দ্রশেখর বসুর প্রাথমিক অর্থ সাহায্য দিয়ে কাজ শুরু হয়। সংগৃহীত এলাকার নাম দেওয়া হয় 'নগেন্দ্র-পত্তন'। নামটি রাজশেখরেরই দেওয়া। টিউবওয়েল, পাকারাস্তা, পার্ক সব তৈরি হয়। গ্রামোন্নয়নে রাজশেখরের নেপথ্য দান ও সক্রিয় সাহায্য ছিল অনেকখানি। কিন্তু বাইরে কেউ জানতো না।

উত্তরবঙ্গে বন্যার সময়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে রিলিফ কমিটি গঠিত হলে তার মধ্যে রাজশেখরও ছিলেন। তাঁর উপর অফিস সংক্রান্ত কাজের ভার ছিল। রাজশেখর কাজের শেষে সম্পূর্ণ হিসাব দাখিল করে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

ব্যক্তিজীবনে রাজশেখর ছিলেন অল্পভাষী, পরিচ্ছন্ন-প্রকৃতি, নিয়মনিষ্ঠ, আদর্শবাদী মানুষ। বিচিত্র বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল। একদা ছবি আঁকতেন; যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন, 'একবার তিনি কিছুদিনের জন্য সুকিয়া স্ট্রীটের এক বাটী ভাড়া করিয়া ছিলেন। সেখানে গিয়া দেখি তিনি ছবি আঁকিতেছেন। তিনি যে চিত্রশিল্পেও সিদ্ধহস্ত, এ পরিচয় তখনই প্রথম পাইলাম। ব্রজেন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়াছি— রাজশেখর অবসরকালে চিত্র অঙ্কনে নিয়োজিত থাকেন। ইহা তাহার একটি হবি বা খেয়াল।' ('রাজশেখর বসু', 'বসুধারা', জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯, পৃ.৩২৩)। রাজশেখরের বইগুলির প্রচ্ছদচিত্র তাঁরই কল্পনাপ্রসূত। গল্পের সঙ্গে যতীন্দ্রকুমার সেনের আঁকা যে ছবিগুলি দেখা যায়, সেগুলিও রাজশেখরের পরিকল্পনা মতো আঁকা হয়েছে। 'প্রেমেচক্র' গল্পের ছবিগুলি রাজশেখর নিজেই এঁকেছেন।

মনোরঞ্জন গুপ্ত লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ যখন ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন, তখন রাজশেখরকে জানালেন, সম্ভব হলে দেশী ধাতুর রং দিয়ে তিনি ছবি আঁকতে চান। রাজশেখর দেশী উজ্জ্বল ধাতুর রং খুঁজে খুঁজে কবিকে পাঠিয়ে দিলেন—তা ব্যবহারও হলো। সেই সময় ভারতের খনিজের প্রতি রাজশেখরের দৃষ্টি আরও গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়।' ('রাজশেখর বসু', "যষ্টিমধু", বৈশাখ ১৩৬৭,পৃ ২৪)। দেশী ও বিদেশী রং-এ আঁকা দু'খানি ছবি রবীন্দ্রনাথ রাজশেখরকে উপহার দিয়েছিলেন।

ফোটোগ্রাফিতেও একদা তাঁর আগ্রহ ছিল। শেষজীবনে পরিমল গোস্বামীকে বলেছেন, 'আজকাল চমৎকার সব ক্যামেরা বেরিয়েছে দেখলে আবার ক্যামেরা ব্যবহার করতে ইচ্ছা হয়।' পরিমল গোস্বামী মন্তব্য করেছেন, "...'আবার ইচ্ছা হয়' মানে এ বিদ্যা তাঁর অজানা নয়। আগে তিনি ক্যামেরা ব্যবহার করেছেন।" ("দ্বিতীয় স্মৃতি", ১৩৬৯ পৃ.১৫১)।

অবসর সময়ে তিনি নানারকম শিল্পদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় জিনিস নিজেই তৈরি করতেন। লেখার ফাইল, খাম ইত্যাদি থেকে শুরু করে ঘড়ির 'পার্টস' জোড়া লাগানো, ঘড়ি 'অয়েল' করা— সবকিছুই নিজে করতেন।

সাহিত্যকর্মের জন্য রাজশেখর স্বীকৃতি নিশ্চয়ই পেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা থেকে শুরু করে আকাদেমী পুরস্কার পর্যন্ত—কিন্তু তবু যেন মনে হয়, সম্ভবত হাসির গল্প

লেখার জন্যই তাঁকে সাহিত্যিক হিসাবে যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয়নি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে জগত্তারিণী পদক এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সরোজিনী পদক দানের দ্বারা সম্মানিত করে। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.লিট. উপাধি তাঁকে দেওয়া হলো ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। কনভোকেশনের অল্প কয়েকদিন পরে কুমারেশ ঘোষকে পত্রে তিনি লিখেছেন, '৭৭ বৎসর পেরিয়ে উপাধিলাভে কিছুমাত্র আনন্দের কারণ নেই, আর ডাক্তার উপাধি তো গড়াগড়ি যাচ্ছে।' (তদেব, পৃ.৬২)। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পরের বছর ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজশেখরকে ডি.লিট উপাধি প্রদান করে।

"কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প" গ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরষ্কার ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজশেখরকে দেওয়া হয়। ভারত সরকার ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজশেখরকে পদ্মভূষণ উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজশেখর পেলেন আকাদেমী পুরষ্কার তাঁর "আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প" গ্রন্থটির জন্য।

কিন্তু জীবনের প্রান্তভাগে এসে যে-সম্মান তিনি লাভ করেন তা অনেক আগেই তাঁর পাওয়ার কথা ছিল। হয়তো কিছুটা অভিমান এবং স্বাভাবিক বিনয়ের সঙ্গেই রাজশেখর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে (১০ জানুয়ারি ১৯৬০) সাহিত্যিকদের সম্বর্ধনার উত্তরে বলেছিলেন,

"আপনারা এতজন মানী কৃতী গুণী এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, আমাকে অভিনন্দিত করেছেন, তাতে আমি কৃতার্থ হয়েছি। আমার বিশেষ আনন্দের কারণ যে সব বন্ধুদের মাঝে মাঝে পৃথক পৃথক দেখেছি আজ তাঁদের একত্র দেখছি। আমার একটা মজ্জাগত লজ্জা আছে, বয়স আশি হলেও তা যায়নি। একটু আধটু প্রশংসা যদি দূর থেকে হাওয়ায় ভেসে আসে তাহলে অবশ্য খুশীই হই। কিন্তু যদি শিলাবৃষ্টির মতন ঘনীভূত প্রশস্তি মাথার উপর পড়ে তবে আতঙ্কিত হই মনে হয় ধরিত্রী ফেটে গিয়ে আমাকে একটু আশ্রয় দিন। ভাগ্যক্রমে আমি কালা,আপনাদের অনেক কথাই শুনতে পাইনি, কিন্তু যেটুকু শুনেছি তাতেই আমার জরাগ্রস্ত কান লাল হয়েছে। যাইহোক, আমার আজকের সংকট কেটে গেছে, ভবিষ্যতে আবার এমন হবে তার সম্ভাবনাও নেই। সুতরাং আমি এখন নিশ্চিত হয়েছি।"

"যেমন বিশেষ বিশেষ বিদ্যা না শিখলে উকিল, ডাক্তার, বিজ্ঞানী ইত্যাদি হওয়া যায় না, তেমনি স্বদেশের আর কিছু কিছু বিদেশের সাহিত্যে ভাল রকম জ্ঞান না থাকলে সাহিত্যিক হওয়া যায় না, তবে লেখক হওয়া যায় বটে। বাঙলা আর বিদেশী সাহিত্যে আমার জ্ঞান অতি অল্প, সে কারণে আমি সাহিত্যিক নই। আসলে আমি আধা মিস্ত্রী, আধা কেরাণী। অভিধান তৈরী আর পরিভাষা বানান ইত্যাদি নিয়ে নাড়াচাড়া মিস্ত্রীর কাজ, রামায়ণ মহাভারত অনুবাদ কেরাণীর কাজ। হালকা বিষয় নিয়ে কিছু কিছু লিখেছি বটে, কেউ কেউ তা মন্দ বললেও অনেকের তা পছন্দ হয়েছে। কিন্তু আধুনিক বাঙলা ভাষায়

যাকে সৃজনীধর্মী সাহিত্য' বলা হয় তার মধ্যে আমার লঘু রচনার স্থান নেই। শিশুসাহিত্যের মতন পরশুরামের লেখাও একটু খাপছাড়া আর বিপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে আছে।"

"পরিশেষে অশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছি, আপনাদের নয়, নিজেকে। অন্ধ আপনাদের প্রীতির যে নিদর্শন পেয়েছি তাতে আমি সত্যই ধন্য এবং অত্যন্ত সম্মানিত হয়েছি।" ("কথাসাহিত্য", কার্তিক ১৩৬৮)।

আশি বছর বয়সে রাজশেখর বললেন, 'আমি সাহিত্যিক নই। আসলে আমি আধা মিস্ত্রী,আধা কেরাণী।' এবং 'পরশুরামের লেখাও একটু খাপছাড়া আর বিপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে আছে।' আসলে দীর্ঘজীবী সাহিত্যিক পরিবর্তিত যুগের সঙ্গে নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারেন না, পূর্ব প্রত্যাশা নিয়ে পাঠক পরিবর্তিত পরিণত কীর্তির বিচার করেন, লেখক পান কখনো প্রশংসা, কখনো নিন্দা। কিন্তু দূরত্ব যায় না। অথচ জীবনের শেষ বছরেও রাজশেখর অসামান্য কতকগুলি গল্প লিখেছেন, মননশীল প্রবন্ধ বেরিয়েছে তাঁর লেখনী থেকে। তাঁকে 'সাহিত্যিক' না বলার কোনো সঙ্গত কারণই নেই।

দীর্ঘ জীবন লাভের ফলে অনেক দুঃখ শোক পেতে হয়েছে রাজশেখরকে। একমাত্র কন্যা প্রতিমার সঙ্গে অমরনাথ পালিতের বিবাহ দেন। পদার্থবিজ্ঞানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিধারী অমরনাথ পালিত প্রথমে বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা করতেন,পরে ক্যালকাটা সোপ ওয়ার্কস লিমিটেড স্থাপন করেন। কিন্তু সাবানের ব্যবসা ভালো না লাগায় তিনি শেষ পর্যন্ত ব্যবহারজীবীর বৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৪৪ বছর বয়সে অমরনাথের মৃত্যু হয়। সতীসাধ্বী প্রতিমাদেবী স্বামীর মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে পরলোকগমন করেন।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে রাজশেখরের পত্নীবিয়োগ ঘটে। সে সময়ে (২.১২.১৯৪২) চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে লেখা তাঁর চিঠিখানিতে 'স্থিতপ্রজ্ঞ' চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়, "মন বলছে, নিদারুণ দুঃখ, চারিদিকে অসংখ্য চিহ্ন তার মধ্যে বাস করে স্থির থাকা যায় না। বুদ্ধি বলছে, শুধু কয়েক বছর আগে পিছে। যদি এর উল্টোটা ঘটত তবে তাঁর মানসিক শারীরিক সাংসারিক সামাজিক দুঃখ ঢের বেশী হত। পুরুষের বাহ্য পরিবর্তন হয় না, খাওয়া-পরা পূর্ববৎ চলে, কিন্তু মেয়েদের উপর খাঁড়ার ঘা পড়ে।"

"নিরন্তর শোকাতুর আর-একজনকে দেখলে নিজের শোক দ্বিগুণ হয়। গতবারে আমার সেই অবস্থা হয়েছিল। এবারে শোক উসকে দেবার লোক নেই, আমার স্বভাবও কতকটা অসাড়, সেজন্য মনে হয় এই অন্তিম বয়সেও সামলাতে পারব।" ('চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য',"স্থিতপ্রজ্ঞ", কথাসাহিত্য, শ্রাবণ ১৩৬০, পৃ.৬২৮)।

এরপর প্রায় আঠারো বছর রাজশেখর বেঁচে ছিলেন। এর মধ্যে অনেক লিখেছেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের একজন ডিরেক্টর হিসাবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাঁর শরীর খারাপ যাচ্ছিল। কিছুদিন

আগে দিল্লীতে সন্তোষ সেনের নার্সিং হোমে একটি অপারেশন করাতে হয়। কলিকাতায় ফিরে কিছুদিন সুস্থ ছিলেন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে প্রথম স্ট্রোকের পর কিছুটা অথর্ব হয়ে পড়েন। কিন্তু লেখা বন্ধ থাকেনি।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে এপ্রিল (১৩৬৭ বঙ্গাব্দের ১৪ই বৈশাখ) সকাল পর্যন্ত বেশ সুস্থ ছিলেন। দুপুরে বেঙ্গল কেমিক্যালের মিটিং-এ যাবার আগে বিশ্রাম করছিলেন। তারপর সকলের অজ্ঞাতে দ্বিতীয় স্ট্রোক, বিশ্রামরত অবস্থাতেই চিরনিদ্রায় মগ্ন হন। 'বেলা একটা হইতে সোয়া একটার মধ্যে তাঁহার মৃত্যু ঘটে বলিয়া অনুমান করা যায়।' ("আনন্দবাজার পত্রিকা", ২৮ শে এপ্রিল ১৯৬০)। অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন, "রাজশেখরবাবু যেতেই চেয়েছিলেন, যে ভাবে গেলেন তার চেয়ে ভালোভাবে কে কবে গেছেন। এ মৃত্যু সাধুসজ্জনের মৃত্যু। কর্মনিষ্ঠ পুরুষের মৃত্যু। এর জন্যে সাধনা করতে হয়। প্রস্তুত হতে হয়। রাজশেখরবাবু একে বহু তপস্যায় অর্জন করেছেন। জীবনের শেষে এটি একটি পূর্ণচ্ছেদ। তাঁর সেই সুন্দর হস্তাক্ষরে 'ইতি' লিখে দাঁড়ি টেনে সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবে তিনি তাঁর জীবনলিপি সমাপ্ত করলেন।" ('রাজশেখর বসু', "যষ্টিমধু", ১৩ বৈশাখ ১৩৬৭, পৃ. ১০)।

কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বইমেলা সংখ্যা, ১৯৯৫।